বঙ্গবন্ধু ও মানবাধিকার

সূচনা:- বিশ্বসম্মোহনীদের নামের তালিকায় বাঙালি জাতিসত্তার ধারক এবং স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার নায়ক জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নাম সর্বাগ্রে।তিনি তাঁর অসামান্য নেতৃত্ব, সাংগঠনিক দক্ষতা, সাহস, দেশপ্রেম ও ত্যাগ তিতিক্ষার মাধ্যমে বিশ্বের বুকে বাংলাদেশকে একটি নতুন মানচিত্র উপহার দিয়েছেন।বাঙালিদের মানবাধিকার রক্ষায় তিনিই ছিলেন পথিকৃৎ।তাইতো কিউবার মহান বিপ্লবী নেতা ফিদের কাস্ত্রো ১৯৭৩ সালে আলজেরিয়ার রাজধানী আলজিয়ার্সে জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনের শীর্ষ সম্মেলনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সাথে সাক্ষাতের পর বলেছিলেন-

"আমি হিমালয় দেখিনি কিন্তু শেখ মুজিবকে দেখেছি।ব্যক্তিত্ব এবং সাহসিকতায় তিনিই হিমালয়।"

জন্ম ও পরিচয়:- বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯২০ সালের ১৭ই মার্চ বর্তমান গোপালগঞ্জ জেলার টুঙ্গিপাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।তাঁর পিতার নাম শেখ লুৎফর রহমান এবং তাঁর দাদার নাম শেখ আবদুল হামিদ। তাঁর মাতার নাম সাহেরা খাতুন।তাঁর আকিকার সময় তাঁর নানা আবদুল মজিদ বঙ্গবন্ধুর নাম রেখেছিলেন শেখ মুজিবুর রহমান এবং বলেছিলেন এ নাম জগৎ জোড়া খ্যাত হবে।পিতা-মাতা তাকে আদর করে 'খোকা' বলে ডাকতেন।দুই ভাই ও চার বোনের মধ্যে তিনি পিতা-মাতার তৃতীয় সন্তান।ভাইবোন ও গ্রামবাসির নিকট তিনি 'মিয়াভাই' বলে পরিচিত ছিলেন।বর্তমানে ১৭ই মার্চ জাতীয় শিশু দিবস হিসেবে পালিত হয়।

মানবাধিকার:- মানবাধিকার মূলত একদিকে জীবনের অধিকার, স্বাধীনভাবে কথা বলার অধিকার, চলাফেরা করার অধিকার; অন্যদিকে অন্ন-বস্ত্র-বাসস্থান-শিক্ষা-স্বাস্থ্য সবকিছুর অধিকার।কার্যত অধিকার ও দায়িত্ব একে অন্যের পরিপূরক। অধিকার পূরণের ক্ষেত্রে অধিকার প্রদানকারীর যেমন দায়িত্ব রয়েছে, তেমনি অধিকার ভোগকারীরও দায়িত্ব রয়েছে।উভয়পক্ষের নিজ নিজ দায়িত্ব পালন ছাড়া অধিকার বাস্তব রূপ পায় না।১৯৪৮ সালের ১০ই ডিসেম্বর জাতিসংঘের সদস্য রাষ্ট্রসমূহ মানবাধিকারের সার্বজনীন ঘোষণাপত্র অনুমোদন করে।জাতিসংঘের অন্তর্ভূক্ত প্রতিটি রাষ্ট্র ১০ই ডিসেম্বর 'মানবাধিকার দিবস' পালন করে আসছে।

এই পৃষ্ঠায় ২৫২টি শব্দ রয়েছে।

বঙ্গবন্ধুর শৈশব ও মানবাধিকার:- বঙ্গবন্ধু ও মানবাধিকার-এই দুটি শব্দ একই সূত্রে গাঁথা।বঙ্গবন্ধুর জন্মই হয়েছিল মানুষের অধিকার সুরক্ষার জন্য।শৈশব থেকে আমৃত্যু তিনি মানবাধিকারের প্রতি নিবেদিত ছিলেন।শিশুকাল থেকেই তিনি মানবদরদি ছিলেন।তাঁর জীবনের লক্ষ্য ছিল, দু:খী মানুষের মুখে যেন হাসি থাকে।

বঙ্গবন্ধুর শিক্ষাজীবন ও মানবাধিকার:- ১৯২৭ সালে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু স্থানীয় গিমাডাঙ্গা সরকারি প্রথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হন।পরবর্তীতে গোপালগঞ্জ মিশন স্কুলে ভর্তি হন।বির্দ্যালয়ের একজন শিক্ষক মুসলিম সেবা সমিতি গঠন করেন।এই প্রতিষ্ঠানের মূল উদ্দেশ্য ছিল গরিব মেধাবী ছেলেদের আর্থিক সহায়তা প্রদান করা।বঙ্গবন্ধু এই সমিতির সক্রিয় সদস্য ছিলেন।এছাড়া তিনি গরিবদের বিভিন্নভাবে সাহায্য সহযোগতিা করতেন।তাছাড়া একবার যুক্ত বাংলার মুখ্যমন্ত্রী শেরেবাংলা গোপালগঞ্জ সফরে যান এবং বিদ্যালয় পরিদর্শন করেন।সেই সময় শেখ মুজিব তাঁর কাছে বিদ্যালয়ে বর্ষার পানি পড়ার অভিযোগ তুলে ধরেন এবং মেরামত করার অঙ্গীকার আদায় করে সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।অসুস্থার কারনে ৪ বছর বঙ্গবন্ধু লেখাপড়া করতে পারেন নি।১৯৪২ সালে এন্ট্রান্স বা প্রবেশিকা পরীক্ষা পাস করেন।এরপর কলকাতা ইসলামিয়া কলেজ থেকে তিনি ১৯৪৪ সালে আইএ এবং ১৯৪৭ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিএ পাস করেন।১৯৪৮ সালে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগে ভর্তি হন।কিন্তু ১৯৪৯ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারীদের আন্দোলনে সমসমর্থন ও নেতৃত্বদানকে কেন্দ্র করে বৈরী অবস্থার সৃষ্টি হলে আইন বিভাগে অধ্রয়নরত অবস্থাতেই তাঁর ছাত্রজীবনের পরিসমাপ্তি ঘটে।

বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক জীবন ও মানবাধিকার- ছাত্রাবস্থা থেকেই জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের রাজনৈতিক জীবনের সূতপাত ঘটে।বাঙারির দাবি আদায়ে তিনি ছিলেন সোচ্চার।১৯৪৮ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমউদ্দিন আইন পরিষদে আইন পরিষদে 'পূর্ব পাকিস্তানের জনগন উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে মেনে নেবে' বলে ঘোষণা দিলে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তাৎক্ষণিকভাবে ওই ঘোষণার প্রতিবাদ জানান। ২ মার্চ ফজলুল হক মুসলিম হলে ভাষার প্রশ্নে এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হলে সেখানে বঙ্গবন্ধুর প্রস্তাবক্রমে 'সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ' গঠন ওঠে।এরপর বিভিন্ন বাধাবিপত্তি পেরিয়ে ১৯৪৯ সালের ২৩ জুন আওয়ামী মুসলিম গঠিত হয়। এর প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ছিলেন মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী।সাধারন সম্পাদক ছিলেন শামছুল হক এবং বঙ্গবন্ধু ছিলেন জয়েন্ট সেক্রেটারি।১৯৫৩ সালে বঙ্গবন্ধু আওয়ামীলীগের সাধারন সম্পাদক নিযুক্ত হন।১৯৫৫ সালের ২২শে সেপ্টেম্বর দলটির নাম থেকে মুসলিম শব্দটি বাদ দেওয়া হয়। বাঙালির মানবাধিকার রক্ষায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৬৬ সালে ৬ দফা দাবি উত্তাপন করেন।এই ৬ দফাকে কেন্দ্র করে পাকিস্তান সরকার বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে প্রধান

এই পৃষ্ঠায় ৩১১টি শব্দ রয়েছে।

আসামি করে মোট ৩৫ জনের বিরুদ্ধে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা দায়ের করে। 'কেন্দ্রীয় ছাত্রসংগ্রাম পরিষদ' ১৯৬৯ সালের ৫ জানুয়ারি ৬ দফাসহ ১১ দফা দাবি নিয়ে আন্দোলন শুরু করে।একপর্যায়ে এ আন্দোলন গনঅভ্যুত্থানে রুপ নিলে ২২ ফেব্রুয়ারি সরকার আগরতলা মামলা প্রত্যাহার করে বঙ্গবন্ধুসহ অন্যান্য আসামিকে বিনাশর্তে মুক্তি দিতে বাধ্য হয়।পরের দিন ২৩ ফেব্রুয়ারি 'কেন্দ্রীয় ছাত্রসংগ্রাম পরিষদ' আয়োজিত এক সংবর্ধনা সভায় জতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পূর্ব বাংলার নামকরণ করেন বাংলাদেশ।তিনি নিজের কোন ব্যক্তিস্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য কখনও সংগ্রাম করেননি, সংগ্রাম করেছেন জনদাবি আদায়ের জন্য ।বাংলা ও বাঙালির অধিকার, বিশেষ করে জনদাবি আদায়ের জন্য বঙ্গবন্ধুর এই আত্মত্যাগের বিবরণ বঙ্গবন্ধু রচিত 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী' এবং 'কারাগারের রোজনামচা' গ্রন্থ দুটির পরতে পরতে উল্লেখ রয়েছে।জনদাবি ও মানবাধিকার সুরক্ষার পতাকা হাতে নিয়েই ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করেন।কিন্তু পাকিস্তান সরকার ক্ষমতা হস্তান্তর না করে নানামুখী তালবাহানার আশ্রয় নেয়।এরই ধারাবাহিকতায় ১৯৭১ সালের ৭মার্চ রেসকোর্স ময়দানে স্মরণকালের সর্ববৃহৎ জনসভায় স্বাধীনতার দিকনির্দেশনা হিসেবে এক ঐতিহাসিক ভাষণ দেন।জনতার জনসমুদ্রে দাঁড়িয়ে তিনি বজ্রকণ্ঠে ঘোষণা করেন- "এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম; এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।জয় বাংলা।"মাত্র ১৮ মিনিটের এই ভাষণই যেন বাঙালির মানবাধিকার রক্ষার ঢাল হয়ে দাড়ায়।কিন্তু পাকিস্তান সরকার ২৫ মার্চ দিবাগত রাতে 'অপারেশন সার্চলাইট' নামে নিরস্ত্র বাঙালি জাতির ওপর অতর্কিতে এক আগ্রাসী আক্রমণ পরিচালনা করে।এমতাবস্থায় রাত ১২টা ২০ মিনিটে অর্থাৎ ২৬শে মার্চের প্রথম প্রহরে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন।এ ঘোষণার পর রাত ১টা ৩০ মিনিটে নিজ বাসভবন থেকে তাঁকে গ্রেফতার করা হয়।সুদীর্ঘ প্রায় দশ মাস পাকিস্তান জেলে তাকে অমানুষিক নির্যাতন করা হয়।বিশ্ব নেতৃবৃন্দের চাপের মুখে তাঁর ১৯৭২ সালের ৮ জানুয়ারি পাকিস্তান সরকার তাঁকে বিনাশর্তে শুক্তি প্রদানে বাধ্য হয়।

বাংলাদেশ, বঙ্গবন্ধু ও মানবাধিকারঃ-আমাদের স্বাধীনতা অর্জনের পর মাত্র ১০ মাসের মাথায় বঙ্গবন্ধু যে সংবিধান উপহার দিয়েছিলেন, সেই সংবিধানে ১৯৪৮ সালে জাতিসংঘ ঘোষিত ৩০টি অনুচ্ছেদসংবলিত সর্বজনীন মানবাধিকার দর্শনের পুরোপুরি প্রতিফলন রয়েছে।তিনি বিশ্বাস করতেন, নিজ নিজ দায়িত্ব সঠিকভাবে সম্পাদন না করলে অধিকার বাস্তবায়ন সম্ভব নয়।সোনার বাংলা প্রতিষ্ঠা করতে হলে সবাইকে দায়িত্ব সম্পাদন করতে হবে।তাঁর ভাষায়, আমরা যদি একটু কষ্ট করি, একটু বেশি পরিশ্যম করি, সকলেই সৎপথে থেকে সাধ্যমতো নিজের দায়িত্ব পালন করি এবং সবচাইতে বড় কথা সকলে ঐক্যবদ্ধ থাকি, তাহলে আমি বিনাদ্বিধায় বলতে পারি, ইনশাল্লাহ, কয়েক বছরেই আমাদের স্বপ্নের বাংলা আবার সোনার

এই পৃষ্ঠায় ৩৫৭টি শব্দ রয়েছে।

বাংলায় পরিনত হবে। অধ্যাপক ড.আবু মো. দেলোয়ার হোসেন ও ড. মো. রহমত উল্লাহ সম্পাদিত এবং জাতীয় মানবাধিকার কমিশন থেকে প্রকাশিত 'বঙ্গবন্ধুর মানবাধিকার দর্শন' গ্রন্থটি বঙ্গবন্ধুর বিভিন্ন সময়ে প্রদত্ত বক্তৃতার সারসংক্ষেপ ও সংবাদভাষ্যের সংকলন।এই গ্রন্থেই বঙ্গবন্ধুর মানবাধিকার সম্পর্কে চিন্তা চেতনার স্বরুপ ফুটে উঠেছে।

মানবাধিকারের অন্যতম দর্শন সাম্প্রদায়িক সম্পীতিতে বঙ্গবন্ধু বিশ্বাসী ছিলেন।বাংলার মাটিতে সাম্প্রদায়িকতা স্থান পাবে না, এ বিষয়ে তার প্রত্যয় ছিল অবচিল।

বঙ্গবন্ধু বলতেন, এই রাষ্ট্রের মানুষ হবে বাঙালি।কাদের মূলমন্ত্র হবে সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই।তিনি রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য ধর্মকে ব্যবহারের বিরুদ্ধে ছিলেন।তার দৃষ্টিতে সব ধর্মই সমান এবং সমঅধিকার দাবিদার ।

বঙ্গবন্ধু দুর্নীতিকে ঘৃণা করতেন।তিনি তার বিভিন্ন বক্তৃতায় দুর্নীতিবাজ-মুনাফাখোর-চোরাকারবারিদের দমনে কঠোর মনোভাব পোষণ করেন।

বঙ্গবন্ধু একজন মানবপ্রেমী মানুষ ছিলেন।মানুষের প্রতি তার অসামান্য দরদ ছিল।মৃত্যুর আগমুহূর্তেও তিনি তার মানবপ্রেমের দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন।বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলার সাক্ষী সেলিম(আব্দুল) ছোটবেলা থেকেই বঙ্গবিন্ধুর পরিবারের সাথে থাকতেন।বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলায় সাক্ষ্য দেওয়াকালে আব্দুল উল্লেখ করেন, দু'জন কালো পোশাকধারী তাকে লক্ষ্য করে গুলি করলে তার হাতে এবং পেটে গুলি লাগে ।গুলি খেয়ে তিনি দরজার সামনেই পড়ে যান । পরে সিঁড়ির পাশে হেলান দিয়ে বসে থাকা অবস্থায় দেখেন, ৪-৫ জন আর্মির লোক বঙ্গবন্ধুকে তাঁর রুম থেকে ধরে সিঁড়ির দিকে নিয়ে যাচ্ছে।যাওয়ার সময় বঙ্গবন্ধু তাকে রক্তাক্ত অবস্থায় দেখে বলেছিলেন,"ঐ ছেলেটা ছোটবেলা থেকে আমাদের এখানে থাকে , একে কে গুলি করলো?" এ রকম একটা অচিন্তনীয় ভীতিকর পরিস্থিতিতেও বঙ্গবন্ধুর মন কেঁদে উঠেছিল কাজের ছেলে আব্দুলের জন্য।১৯৭৫ সালের ১৫ই আগষ্ট সেনাবাহিণীর কিছুসংখ্যক বিপথগামী সদস্য বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে হত্যা করে।

উপসংহারঃ- বঙ্গবন্ধু অন্যের মানবাধিকারের ব্যাপরে সোচ্চার ছিলেন।অথচ তাঁর জীবন কেড়ে নেওয়া হয় মানবাধিকারের চরম লঙ্ঘনের মাধ্যমে। স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম রাষ্ট্রপতি জাতির জনক বাঙাগবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বিদেহী আত্মার স্মৃতির প্রতি দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে আমাদের অঙ্গীকার হচ্ছে-

সোনার বাংলা গড়বো পিতা
কথা দিলাম তোমায়;
চেতনা থেকে বিচ্যুত হবো না
গ্রেনেড তবা বোমায়।

এই পৃষ্ঠায় ২৯২টি শব্দ রয়েছে। মোট ১২১০ শব্দের মধ্যে রচনাটি লেখা হয়েছে।